বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
উপস্থিত:
বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস
এবং
বিচারপতি মো: রিয়াজ উদ্দিন খাঁন

ডেথ রেফারেন্স নং ১৬৮ /২০১৭

পক্ষগণ
রাষ্ট্র
বনাম
মোসা: সালেহা খাতুন
জনাব এস.এম আশ্রাফুল হক, ডিপুটি এ্যর্টনী জেনারেল সংগে
জনাবা ফাতেমা রশিদ, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল, সংগে
জনাব মো: আকবার হোসেন, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল।
..... রাষ্ট্রপক্ষে।
জনাব এ. এম. মাহাবুব উদ্দিন, এ্যাড. সংগে
জনাব এইচ. এম সানজীদ সিদ্দিকী, এ্যাড.
..... বিবাদী পক্ষে।

ক্রিমিনাল আপীল নং ৪৮৭৭/২০২৩

মোসা: সালেহা খাতুন
..... সাজাপ্রাপ্ত আসামী।
বনাম
রাষ্ট্র
..... রাষ্ট্র পক্ষে।
জনাব এ. এম. মাহাবুব উদ্দিন, এ্যাড. সংগে
জনাব এইচ. এম সানজীদ সিদ্দিকী, এ্যাড.
.... সাজাপ্রাপ্ত আসামী আসামীর পক্ষে।
জনাব এস.এম আশ্রাফুল হক, ডিপুটি এ্যর্টনী জেনারেল সংগে
জনাবা ফাতেমা রশিদ, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল, সংগে
জনাব মো: একবার হোসেন, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল।
..... রাষ্ট্রপক্ষে।

জেল আপীল নং ৮৩/২০২৩

মোসা: সালেহা খাতুন
..... সাজাপ্রাপ্ত আসামী।
বনাম
রাষ্ট্র
..... রাষ্ট্র পক্ষে।
জনাব এ. এম. মাহাবুব উদ্দিন, এ্যাড. সংগে
জনাব এইচ. এম সানজীদ সিদ্দিকী, এ্যাড.
.... সাজাপ্রাপ্ত আসামীর পক্ষে।

জনাব এস.এম আশ্রাফুল হক, ডিপুটি এ্যর্টনী জেনারেল সংগে
জনাবা ফাতেমা রশিদ, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল, সংগে
জনাব মো: একবার হোসেন, সহকারী এ্যর্টনী জেনারেল।
..... রাষ্ট্রপক্ষে।

শুনানীর তারিখ: ৩০/১১/২০২৩, ১৪/১২/২০২৩, ১৭/১২/২০২৩
রায় প্রদানের তারিখ: ১০/০১/২০২৪।

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস:

ঢাকাস্থ ৪ নং দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক ও দায়রা জজ ট্রাইবুনাল নং ২৯৩/২০১৫ মামলায় একমাত্র অভিযুক্ত মোছা: সালেহা খাতুন শিউলীকে (শিউলী) স্বামী হত্যার দায়ে দোষী সাব্যাস্ত করে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করেন। উক্ত রায় ও আদেশ অনুমোদনের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারায় বর্তমান ডেথ রেফারেন্স মামলা নং ১৬৮/২০১৭ নিবন্ধিত হয়। অত:পর একই রায়ের বিরুদ্ধে জেল আপীল নং ৮৩/২০২৩ এবং ফৌজদারী আপীল নং ৪৮৭৭/২০২৩ রুজু হয়। বোধগম্য যে, অভিন্ন রায় থেকে উদ্ভুত এই তিনটি মামলা, ডেথ রেফারেন্স এবং আপীল মামলাগুলী একত্রে শুনানী করা হয় এবং বর্তমান রায় ও সিদ্ধান্ত দ্বারা অত:পর নির্দেশিত হয়।

রাষ্ট্র পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত সার হল দন্ডিত শিউলী এবং নিহত মো: মহসিন স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। তারা পল্লবী থানাথীন সেকশন ১২/ডি, ডুইপ প্লট, লাইন নং ২৯/এ বাসা নং ১৭, ২য় তলা, পল্লবী, ঢাকা একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। নিহত মহসিনের বয়স

অনুমান ৪৭ বছর। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। ২৭/১০/২০১২ তারিখ নিহত মহসিনের বড় ভাই ঢাকা মেট্রোপলিটনের পল্লবী থানায় এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, শিউলী চরিত্রগতভাবে সৈরিনী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরুষের সাথে পরোকীয়া প্রেমে আসক্ত ছিলেন। সে কারনে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তিক্ত ছিল। ঘটনার তারিখ অর্থ্যাৎ ২৬/১০/২০১২ তাদের বাসায় দন্ডিত শিউলী এবং তার দুই প্রেমিক একই উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগ সাজসে মহসিনকে গলা কেটে হত্যা করে। তদুপরি মহসিনের পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ ধারালো অস্ত্র দ্বারা কেটে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুমূর্ষ মহসিনকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মহসিনকে মৃত ঘোষনা করে। অত:পর সেখানে মহসিনের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরের দিন মৃতের বড় ভাই এই এজাহার করেন।

মামলা প্রমানের জন্য রাষ্ট্র পক্ষ মোট ৭ জন সাক্ষী হাজির করেন। বলাবাহুল্য তার মধ্যে কেউই ঘটনার প্রতাক্ষ্য সাক্ষী নয়। তবে মামলার গুরুত্বপূর্ন উপাদান হল শিউলী আটক হবার পর ২৯/১০/২০১২ তারিখ ম্যজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে এক বিস্তারিত স্বীকারউক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন। তার ভিত্তিতেই মামলা অগ্রসর হয়। শিউলির কথিত

স্বীকারউক্তির সংক্ষিপ্ত সার হলো: মহসিন প্রতারক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যিনি সামান্য শিপাহী হওয়া সত্ত্বেও ভুয়া সামরিক কর্মকর্তার পরিচয়ে শিউলিকে বিবাহ করেন। তবে বিশেষভাবে মহসিন লম্পট স্বভাবের ছিলেন এবং এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অসংখ্যবার অসংখ্য নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। এ বিষয় স্বাভাবিকভাবেই শিউলী খাতুন অত্যান্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। ঘটনার তারিখ ২৬/১০/২০১২ইং দুপুর অনুমান তারিখ ১২.৩০-১৩.০০ ঘটিকার সময় মহসিনের আনা এক বোতল এনার্জি ড্রিংকের সাথে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে শিউলি তার স্বামীকে পান করায়। মহসিন দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েন। এই ফাকে ঘরে থাকা পশু জবাই করা ছুরি দিয়ে শিউলী তার স্বামীর পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কেটে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন করে এবং তার কণ্ঠনালীও কেটে ফেলেন। শিউলীর ভাবনা মোতাবেক মহসিন তখনও জীবিত ছিল মনে করে তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএম এইচ) এ নেওয়া হয় এবং কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অত:পর শিউলী সেচ্ছায় রক্তে ভেজা তোষক এবং হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত ছুরিসহ ২৬/১০/২০১২ তারিখ পল্লবী থানায় হাজির হয়ে এই ঘটনা প্রকাশ করেন।

তদন্তে শিউলীর বিরূদ্ধে ৩০২ ধারার অভিযোগ অকাট্যভাবে প্রমানিত সাব্যস্ত করে চার্জশিট প্রদান করা হয়। পুলিশী প্রতিবেদন আমলে গ্রহন করে দায়রা মামলা ৮৪/২০১২ রুজু হয় এবং পরবর্তীতে দ্রুত নিষ্পতির জন্য

মামলাটি ঢাকা মহানগর দায়রা আদালত থেকে ৪ নং দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে বদলি করা হয়।

অভিযোগ প্রমানকল্পে রাষ্ট্রপক্ষ ০৭ জন স্বাক্ষী হাজির করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, তারা কেউই মুল ঘটনার সাক্ষী নয়। আসামীকে কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। সেখানেও সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন এবং পরবতীকালে তিন জন সাফাই সাক্ষী হাজির করা হয়। তারা হলো দন্ডিত শিউলী খাতুন নিজে এবং তার দুই পুত্র ডি. ডব্লিউ. ২ এবং ৩। সাক্ষী প্রমান পর্যালোচনান্তে বিজ্ঞ দায়রা জজ শিউলী খাতুনকে পূর্বোক্তরুপে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যাস্ত করে প্রাণ দন্ড প্রদান করেন। অবশ্য সেইকালে শিউলী খাতুন জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। আমরা দন্ডিত শিউলী খাতুনের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী এ. এম মাহাবুব উদ্দিন এবং এইচ. এম সানজীদ সিদ্দিকী এর বিস্তারিত যুক্তিতর্ক এবং বিজ্ঞ ডিপুটি এর্টনী জেনারেল জনাব এস. এম আশ্রফুল হক এর বক্তব্য শ্রবন করলাম এবং নিম্নআদালতের নথিসহ সমুদয় নথিপত্র পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র পক্ষের ২ নং স্বাক্ষী মজনু মিয়া মৃত মহসিনের ভাই তিনি বলেন ২৬/১০/২০১২ তারিখ মহসিন মারা যায় তিনি তার চাচার মেজর অবঃ প্রাপ্ত হাফিজের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ঢাকা সামরিক হাসপাতালে যান এবং সেখানে ভাইকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। সেখানে আসামী শিউলী ও তার ভাইয়ের ২ ছেলেকে সহ আরো

২ জনকে দেখতে পান। আসামীর ২ পুত্র তার মামা বাড়িতে থাকেন। তিনি পল্লবী থানায় যান এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন এজাহার করেন নাই। এজাহারে কি লেখা আছে তা তিনি জানেন না। তবে তার সই নেওয়া হয়। থানায় মৃত দেহের সঙ্গে আসামীরা উপস্থিত ছিল এবং সেখানে থেকে শিউলিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি জেড়ায় স্বীকার করেন যে, এজাহারে তিনি আসামীর নাম বলেন নাই। ঠিকানাও বলেন নাই। ৩নং স্বাক্ষী জামান মোল্লা নিহত মহসীনের প্রতিবেশী তিনি বলেন ঘটনার দিন তিনি ছিলেন না। তবে রাত আনুমানিক ২.০০টার সময় তার বাসায় গিয়ে শুনতে পান যে মহসিনকে সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি মারা গেছেন। পরে তিনি জব্দনামায় সই করেন। জব্দনামায় কি লেখা ছিল তা তিনি জানেন না। তিনি কোন আলামত দেখেন নাই। লাশও দেখেন নাই। রাষ্ট্র পক্ষের ৪ নং স্বাক্ষীও মহসীনের প্রতিবেশী তিনি সংক্ষেপে বলেন যে, মহসীন কিভাবে মারা গেল তা তিনি জানেন না। তাকে রাষ্ট্র পক্ষ থেকে বৈরী ঘোষনা করে জেরা করা হলেও অভিযোগ যে সত্য এই মর্মে স্বাক্ষী মিথ্যা বলেছেন এরুপ কোন ধারনা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র পক্ষের ৫ নং স্বাক্ষী তানভির আহমেদ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ২৯/১০/২০১২ তারিখ তদন্তকারীর উপস্থাপন মতে সালেহা খাতুন শিউলীর স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী (প্রদঃ ৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে ব্যবহার করেন এবং তাতে শিউলী স্বাক্ষর করেন। তাকে আসামী

পক্ষ থেকে জেরা করা হয় যে, কথিত স্বীকারউক্তি শিউলী বেগমের ইচ্ছাকৃত নয়, সত্য নয় এবং তাকে বলেও শোনানো হয় নাই। স্বাক্ষী ও সাজেসন অস্বীকার করেন। ৬ নং স্বাক্ষী তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা। সর্বশেষ তথা ৭ নং স্বাক্ষী ডা: সোহেল মাহমুদ।

অপরদিকে দন্ডিত শিউলী খাতুন সাফাই স্বাক্ষ্যে বলেন ঈদ উপলক্ষে ২৫/১০/২০১২ তারিখ তিনি তার ২ ছেলে সহ বড় বোনের বাসায় যান। তার স্বামীও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। বিকাল ৫.০০টায় কোন এক ব্যক্তি ফোনে জানায় যে, মহসিন অসুস্থ। তাকে ঢাকা সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আসামী তার ২ ছেলে, বোন ভগ্নিপতিসহ ঢাকা সামরিক হাসপাতালে যান এবং তার স্বামীকে মৃত দেখতে পান। CMH থেকে তার স্বামীর লাশ থানায় নেওয়া হয়। স্বামীর সঙ্গে তার সুম্পর্ক ছিল। পুলিশ যেভাবে বলেছে তিনি সেইভাবে জবানবন্দি দিয়েছে। বয়ান দেওয়ার সময় পুলিশ কর্মকর্তা হাকিমের সামনেই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে জবানবন্দী পড়ে না শূনায়ে ধমক দিয়ে সহি নেওয়া হয়। তিনি স্বামীকে পরিকল্পতভাবে খুন করার মর্মে সাজেসন অস্বীকার করেন। ২ নং সাফাই স্বাক্ষী আসামী তথা মৃত মহসিনের বড় ছেলে মো: ফয়েজউল্লাহ তিনি সেইকালে কলেজে ২য় বর্ষে পড়তেন। ঘটনার তারিখ ও সময় তিনি মা ও ছোট ভাই সহ খালার বাসায় ঈদ করতে যান। পরের দিন পিতা সেখানে যাওয়ার কথা ছিল পিতা যায় নাই। বিকালে কেউ একজন ফোন

করে জানায় যে তার পিতা অসুস্থ সামরিক হাসপাতালে। তিনি ভাই, মা, খালা, খালুসহ CMH পৌছান এবং জানতে পারেন যে, পিতা মহসিন মারা গেছেন। পুলিশ লাশ নিয়ে থানায় যায় সেখানে তার মা, ২ ভাই অনুসরন করেন পরে থানা থেকে মাকে গ্রেফতার করা হয়। পিতার সাথে মায়ের দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের ছিল। তিনি জেরায় বলেন যে তার পিতাকে কে বা কারা CMH নেয় তিনি বলতে পারেন না। সন্ধ্যা ৭.০০টার সময় তিনি থানায় পৌছান। পরে থানা থেকে তার মাকে গ্রেফতার করা হয়। মাকে বাচানোর জন্য মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন মর্মে সাজেসন। এই সাফাই স্বাক্ষী অস্বীকার করেন। এই মর্মে সাফাই স্বাক্ষী শিউলী বেগমের ছোট ছেলে ফরহাদ উল্লাহ বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি নবম শ্রেনীতে পড়তেন। তারা প্রধানত মামা বাড়িতে থাকেন। ঘটনার তারিখ ঈদ থাকায় তারা দুই ভাই, মা সহ বড় খালার বাড়িতে ছিলেন। পরের দিন ঈদ ছিল তার পিতার যাওয়ার কথা ছিল যান নাই। বরং বিকেলে CMH থেকে সংবাদ আসে যে তার পিতা মারা গেছেন। তারা CMH যান পরে লাশের সংগে থানায় যান। তিনিও রাষ্ট্র পক্ষের সব সাফাই স্বাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই পর্যন্ত ছিল রাষ্ট্রও সাফাই স্বাক্ষীর সংক্ষিপ্ত বিবরন।

কেবলমাত্র স্বীকারউক্তির উপর ভিত্তি করে সাজা দেওয়া আইন সঙ্গত নয়। এ নিয়ে অজস্র সিদ্ধান্ত আছে। তবে সকল ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই স্বীকারউক্তিতে যা বলা হয়েছে সেটা আদালতের কাছে সত্য এবং স্বেচ্ছা পণোদিত মর্মে প্রতিপন্ন হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কেবল মাত্র স্বীকারউক্তি নয় স্বীকারউক্তি বক্তব্য সমর্থন করে এমন Independent Evidence লাগবে। বর্তমান ক্ষেত্রে এইরুপ Independent Evidence আনার অনেক সুযোগ ছিল। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন শক্ত সামার্থবান পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে তার স্ত্রী বা একজন নারী একাকী তাকে গলা কেটে হত্যাসহ পুরুষাঙ্গ ও অন্ডোকোষ কেটে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন করতে পারে না যদি না কেউ তাকে সাহায্য করে থাকে অথবা ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ অচেতন থাকে। মহসিনকে যে চেতনা নাশক ঔষধ খাওয়াইয়ে অচেতন করা হয় এই মর্মে রাষ্ট্র পক্ষের কোন স্বাক্ষী নাই। এমনকি ঘটনার সময় মহসিনের পার্শ্বে তার একমাত্র স্ত্রী শিউলি খাতুন ছিল আর কেউ ছিল না এই বিষয় আর কোন স্বাক্ষ্য নাই। সবকিছুর জন্যে আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে শিউলী খাতুনের জবানবন্দীর উপর। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি মহসিনের ভিসারা পরীক্ষা করা হত সেক্ষেত্রে চেতনা নাশক ঔষধ খাইয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল কিনা তার প্রমান পাওয়া যেত যা শিউলী খাতুনের স্বীকারউক্তিমূলক জবানবন্দীকে সমর্থন করতে পারত। ২য়ত যে প্লাষ্টিকের বোতলটিকে জব্দ করা হয়েছে সেটি যে এনার্জি

ড্রিংক এবং তার মধ্যে যে চেতনা নাশক ঔষধ ছিল সেই বোতলটিও পরীক্ষা করা হয় নাই। ফলে শিউলী খাতুনের কথিত স্বীকারউক্তির এই অংশ যে সত্য ছিল সেটি বলার কোন সুযোগ রাষ্ট্র পক্ষ রাখে নাই।

তদুপরি শিউলী খাতুনের বয়ান মোতাবেক তা ঘটনার পরবর্তী রাত্রেই ২৬/১০/২০১২ইং পল্লবী থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অথচ তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় দুই দিন পর অর্থ্যাৎ ২৮/১০/২০১২ইং তারিখ এবং তার বয়ান রেকর্ড করা হয় ২৯/১০/২০১২ইং তারিখ অর্থ্যাৎ এইক্ষেত্রে পুলিশী হেফাজত থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টার বেশি তাকে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয় এবং নিম্নআদালতের নথি থেকে দেখা যায় যে শিউলী খাতুনকে আহত করা হয়েছে। এই বিবিধ কারণে শিউলী খাতুনের কথিত স্বীকারউক্তি তার গ্রহনযোগ্যতা হারিয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই নি:শংষ হত্যাকান্ডের কোন প্রতাক্ষ্য স্বাক্ষী নাই। শিউলী খাতুনের কথিত স্বীকারউক্তি (প্রদ: ৩) মোতাবেক তার স্বামী মহসিনের চরিত্র দোষ এবং দীর্ঘ দিনের অনৈতিক নারী লিপ্সার কারনে তিনি যারপরনাই ক্ষিপ্ত ছিলেন। কিন্তু মহসিন সংক্রান্ত এই অংশটির প্রতি কোন স্বাক্ষীই আলোকপাত করেন নাই। প্রদশনী-৩ মোতাবেক শিউলী খাতুন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পানির মধ্যে বেশী পরিমান ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে স্বামীকে অজ্ঞান করে প্রথমে রান্না ঘরে রাখা ছুরি দিয়ে স্বামীর পুরুষঙ্গসহ অন্ডকোষ কেটে বিচ্ছিন্ন করেন

তারপরে গলাকেটে হত্যা করেন। অথচ সেই ঔষধযুক্ত পানিয়ে শিশি এবং তাতে যে কোন বিষাক্ত পদার্থ ছিল মর্মে কোন রাসায়নিক প্রতিবেদন আদালতে আসে নাই। যা আশ্চার্য ঘটনা। ফলে আইনত এ কথা বলা চলে না যে হত্যার পূর্বে মহসিনকে কড়া ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়। যদি তা না হয়ে থাকে এমনকি যদি ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েও থাকে সেক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর একজন শক্ত সমার্থ পুরুষ এই পরিমান জখম করা হলো অথচ তার ঘুমই ভাঙ্গলো না এটি স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় না। আরো একটি পদ্ধতিগত অনিয়োম হলো ঘটনাস্থল ঢাকা ক্যান্টমেন্ট থানার অন্তর্গত এবং ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক হাসপাতাল মহসিনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। সেক্ষেত্রে ক্যান্টমেন্ট থানাতেই মামলার কার্যক্রমের সূত্রপাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয় নাই। শিউলী খাতুনের কথিত বয়ান মোতাবেক তিনি নিজেই লাশ বহন করে পল্লবী থানায় যান। অপরদিকে মৃতের ভাই এজাহার করলেও তিনি (২ নং স্বাক্ষী) আসামীর বিরুদ্ধে কোন স্বাক্ষ্য দেন নাই। ২৫/১০/২০১২ তারিখ হত্যাকান্ড ঘটে ঐ দিনই শিউলী খাতুন থানায় হাজির হন এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তাকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিধি মোতাবেক ম্যাজিস্টেটের নিকট হাজির না করে ২৯/১০/২০১২ তারিখ হাজির করা হয়। এ সকল অনিয়ম রাষ্ট্রপক্ষের মামলাকে দৃশ্যতই দুর্বল করেছে। সর্বপরি প্রশিকিউসনের বক্তব্য মোতাবেক শিউলী খাতুন নিজেই

মৃতের রক্তে ভেজা তোষক এবং রক্ত মাখা ছুরি বয়ে নিয়ে থানায় যান যা কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অথচ তোষকে এবং ছুরিতে লেগে থাকা রক্তের কোন ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয় নাই। বরং তদন্তকারী দারোগা বলেন ঘটনাস্থল থেকে জব্দ করেন যা বৈস্বাদৃশ্য পূর্ন। সার্বিক আলোচনায় আমরা এই বিষয়ে সম্পুর্ন একমত হতে পেরেছি যে, দন্ডিত শিউলী খাতুনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় আনিত অভিযোগ আইনের ন্যায় দন্ডে অপ্রমানিত রয়ে গেছে।

ফলে বর্তমান ডেথ রেফারেন্স নং ১৬৮ /২০১৭ (Rejected) বা গ্রহন করা হল না এবং সেই সূত্রে জেল আপীল নং ৮৩/২০২৩ এবং ক্রিমিনাল আপীল নং ৪৮৭৭/২০২৩ (Allowed) বা মঞ্জুর করা হল। ঢাকাস্থ ৪র্থ দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ দায়রা জজ প্রদত্ত ০৬/১২/২০১৭ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ বাতিল করা হল।

দন্ডিত শিউলী খাতুনকে অন্য কোন মামলায় আবাশ্যক না হলে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হউক।

রায়ের কপি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মো: রিয়াজ উদ্দিন খাঁন: